বকুল কথা : সময়ের ভ্রান্ত পাঠ

রামী চক্রবর্তী

> "Every time we talk we give order to the world.
> Every time we write or read a literary text
> we give the gratest degree of possible order to a world."

প্রতিটি উচ্চারণ প্রতিবেদনে গভীর তাৎপর্য সন্ধানের মধ্য দিয়ে উপন্যাসের মৌল আকল্পকে নিয়ন্ত্রিত করে সেইসব উচ্চারণ অবশ্যই সময়বাহিত। তাই সার্থক উপন্যাসের গ্রন্থিডোরটি যে সময় ও পরিসরের নিশ্ছিদ্র বাঁধনে বিন্যস্ত হবে, সেটাই এর প্রাকশর্ত। আর ঔপন্যাসিক যদি নিজেই সে-দায়িত্ব হাতে তুলে নেন, কাল - পরম্পরায় মানব - মানবীর শুশ্রূষার বার্তা শোনাতে তবে সেখানে সময়ের ধারাবাহিক বিন্যাস লেখকের নিজের কাছেই শর্তাধীন হয়ে শোনাতে তবে সেখানে সময়ের ধারাবাহিক বিন্যাস লেখকের নিজের কাছেই শর্তাধীন হয়ে পড়ে। পাঠকের উত্তরোত্তর জিজ্ঞাসার অশান্ত তরঙ্গ বারবারই যে পাঠকৃতির তটরেখায় উত্তর খুঁজতে আছড়ে পড়ে কখনো পাঠকৃতির সূত্রধর হিসেবে লেখক নিজেই পাঠককুলকে পথনির্দেশের দায় তুলে নেন তো কখনো আবার শুধুমাত্র ইঙ্গিত দিয়ে যান; আর পাঠক তখন নিবিড় অমারাত্রিতে ঝল্‌সে ওঠা বিদ্যুৎরেখায় পথ চিনে নেওয়ার চেষ্টা করেন। পাঠকৃতির আদি সূত্রধার হিসেবে পাঠকের সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়ে দিয়েই তিনি যেন এক নৈর্ব্যক্তিক অবস্থানে সরে যান। কিন্তু সময় পরিসরের এই যুগলবন্দিতে যদি পাঠকৃতির সম্ভাব্য শর্তটি অস্বীকৃত থেকে যায়, তখন পাঠকৃতির নির্যাস কোনো সম্ভাব্য উত্তরণে পৌঁছোতে পারে না। লেখকের ইচ্ছাধীন শর্তের সঙ্গে পাঠকের সম্ভাব্য জিজ্ঞাসার কোনো সংযোগসূত্রই বহন করতে পারে না সেই পাঠকৃতি। যে-কথাটি আগে বলা হয়েছে সময় এবং পরিসরের পারস্পরিক সম্পর্কের বিন্যাস, তা-ও যেন ঝাপ্‌সা হয়ে আসে। প্রকৃত সময় এবং আপাত সময়ের দ্বন্দ্বে মুখর যে পরিসর, তাতে ঔপন্যাসিকের বাচনিক মনন যদি স্পষ্ট না হয়, তখন পাঠকের পক্ষেও তার উৎকর্ষ সম্পূর্ণ দুরূহ হয়ে পড়ে।

অশাপূর্ণার 'বকুল কথা' -ও সেই সময় পরিসরের আস্তিত্বিক বিন্যাসের ভ্রান্তপাঠ বলেই মনে হয়। ত্রয়ী উপন্যাসের শুরুতেই সময়ের একটি খসড়া নির্মাণ করে নিয়েছিলেন আশাপূর্ণা, যেখানে সত্যবতী থেকে বকুল প্রত্যেকেই এক - একটি কালের প্রতিনিধিত্ব করছে এবং পাঠকের কৌতুহলের পারদও সেই সময়ের প্রগতির বার্তা পেতে বেড়েই চলে। কিন্তু এখানেই আশাপূর্ণার শিল্প - সংবিদ। পাঠকের ঋজু চিন্তন প্রণালীতে যেন একটি জোর ধাক্কা দিয়ে যায়। 'বকুলকথা'-র পাঠকৃতিকে আত্মস্থ করতে করতেই পাঠক আবিষ্কার করেন সময়ের এক অসমবায়ী দলিলকে। অনামিকা দেবীর ছদ্মবেশে বকুল যেন কোথায় হারিয়ে যায়। বকুলের হারিয়ে যাওয়া খাতা খুঁজে বের করার কোনো দায় তাকে না অনামিকাদেবীর। আর সেই সঙ্গে পাঠকের কাছেও অনাবিষ্কৃত থাকে বকুল থেকে অনামিকা দেবী হয়ে ওঠার অনুক্ত কাহিনি। বকুলের অগ্রন্থিত কাহিনির জন্য কি লেখিকার অসচেতন সময়দর্শনকে দায়ী করব? সুবর্ণলতার আখ্যানে আমরা লক্ষ করি ঔপন্যসিকের সেই পরম্পরাগত সময়ের ব্যঞ্জনাকে ধরে রাখার অকুণ্ঠ স্বীকারোক্তি।

''সুবর্ণলতা একটি বিশেষ আলেখ্য। যে কাল সদ্যবিগত যে কাল হয়তো বা আজ ও সমাজের এখানে সেখানে তার ছায়া ফেলে রেখেছে, 'সুবর্ণলতা' সেই বন্ধন জর্জরিত মুক্তিকামী আত্মা ব্যাকুল যন্ত্রণার প্রতীক।

'আর একটি কথা বলা আবশ্যক। আমার প্রথম প্রতিশ্রুতি গ্রন্থের সঙ্গে এর একটি যোগসূত্র আছে। যে যোগসূত্র কাহিনির প্রয়োজনে নয়, একটি 'ভাব'কে পরবর্তী কালের ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজনে।

সমাজবিজ্ঞানীরা লিখে রাখেন সমাজের বিবর্তনের ইতিহাস, আমি একটি কাহিনির মধ্যে সেই বিবর্তনের একটি রেখাঙ্কনের চেষ্টা করেছি মাত্র।''

আশাপূর্ণা এমন একটি বিশেষ নির্দিষ্ট কালের কথকতাকে ধারাবাহিকতায় তুলে ধরবেন এমন প্রত্যাশারই ইঙ্গিত শোনান আমাদের। তখন পাঠকৃতির ভাষারূপে তাৎপর্যবহ হয়ে ওঠে প্রকৃত সময়ের যে-ইঙ্গিত, তাকে ঔপন্যাসিকের অন্নিষ্ট বলে ভাবতে ইচ্ছে করে। একটি ভাবকে পরবর্তীকালের ভাবের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়ার যে সম্ভাব্য প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন তিনি, তাতে তো সত্যবতীর সঙ্গে শৈশবে শিকড়-ছিন্ন সুবর্ণলতার অপূর্ণ জীবনকালের সীমাহীন যন্ত্রণার সেতু তৈরি হয়ে যায়। ইতিহাসকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দৃষ্টিবন্দি করেছিল বকুল, অবোধ মনের বিহ্বল নির্বাক প্রশ্নে সে সাক্ষী হয়েছিল ছাদের কোণে তার মায়ের বাঙ্ময় সৃষ্টির জ্বলে - ওঠা চিতার ধ্বংসসীলার। সেই বকুল সুবর্ণলতার শেষ বয়সের সন্তান হিসেবে মায়ের 'না - হয়ে - ওঠা'র ইতিহাসকে আত্তীকৃত করে নিয়ে অনামিকা দেবী হয়ে উঠল কীভাবে, সেই কথাটাই হতে পারত 'বকুলথার তিনশো পাতার বিস্তৃত বৃত্ত জুড়ে আশাপূর্ণ যে খণ্ড খণ্ড চিত্র জুড়ে এক বিকৃত সময়ের দলিল তুলে ধরলেন, তাতে কিন্তু ভাবগত দিক থেকে ত্রয়ী উপন্যাসের কালপরম্পরার রৈখিকতাটি হারিয়ে গেছে। শম্পা কিংবা সত্যভামা এরা বকুলের সহোদরের সন্তান সন্ততি অর্থাৎ চতুর্থ প্রজন্ম। ফলে প্রথম প্রতিশ্রুতি থেকে বকুল কথা - আখ্যানের পরম্পরাক্রমে যে - সময়ের ক্রম বিবর্তনরেখাকে তুলে ধরার শর্তে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন লেখিকা কিংবা সময়ের যে - সম্ভাব্য উত্তরণ জরুরি ছিল, তা স্পষ্ট হল না, অথচ লেখিকা সুবর্ণলতার আখ্যানে জানিয়েছিলেন।

''সমাজ বিজ্ঞানীরা লিখে রাখেন সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস, আমি একটি কাহিনির মধ্যে সেই বিবর্তনের একটি রেখাঙ্কনের সামান্য চেষ্টা করেছি মাত্র।''

আশাপূর্ণার পরাপাঠ সম্পর্কিত এই জরুরি ঘোষণা কিন্তু পরবর্তী পাঠকৃতির আখ্যান বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও প্রস্তাবক হিসেবে সমান প্রায়োগিক ভূমিকা পালন করবে, এই স্বঘোষিত প্রত্যাশাকে পূরণ করেননি তিনি।

বকুলকথার আখ্যানে বকুলের 'নিজস্ব খাতা' হারিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গটি বর্ণিত ঘটনার ক্ষেত্র দিতে বারবার ধ্রুবপদের মতো ফিরে এসেছে। এই পারুলের অভিমান ভরা খাম এসে পৌঁছেছে বকুলের কাছে, যখনই পাঠক পারুলের স্মৃতি - বিস্মৃতির কথামালার সূত্র ধরে সুবর্ণের পরবর্তীকালের নারীর বিবর্তিত ইতিহাসের বিষণ্ণতাকে ছুঁতে চেয়েছে—ঠিক সেই সময়েই যেন ঔপন্যাসিক কিছুটা 'তফাৎ যাও'...এর মতো জড়তামুক্ত আত্মজাগরণে বকুলের হারিয়ে যাওয়ার খাতার বিষয়টি ফিরিয়ে এনেছেন। তবে কি আশাপূর্ণা নিজে এই

অসংগতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। আর তাই কিছুটা হলেও দায়সারাভাবে বকুলের ভূমিকাকে নায়িকা থেকে দর্শকের অবস্থানে পাল্টে দেন। সুবর্ণলতা যে নিরাকার শূন্যতায় একদিন সব নিঃশেষ করে দিয়ে গভীর অভিমানে চলে গিয়েছিল, নারীর সেই বিবর্ণ ধূসরতার ছবিকেই তো বকুল তার মায়ের প্রতিনিধিত্বে লিখে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছিল। 'সেই পুড়ে যাওয়া — হারিয়ে যাওয়া না - লেখা - বোবা যন্ত্রণার ইতিহাস'কে লিপিবদ্ধ করতে চেয়েছিল বকুল। কিন্তু আখ্যানগত সত্য কিংবা ঔপন্যাসিকের মনোগত সত্য—দুইকেই যেন এখানে এড়িয়ে যান লেখিখা। আর আপাত -সময়ের যে গ্রন্থনায় গড়ে ওঠে আখ্যানের স্বর, তাতেও কিন্তু ধারাবাহিকতার সূত্রটি খেই হারিয়ে ফেলে। উৎকর্ষতার নিরিখে বিচার্য না হলেও এ তথ্যের কোনো বিকল্প নেই যে, একইসঙ্গে আশাপূর্ণা একাধিক উপন্যাসের ধারাবাহিক লেখিকা। ফলে আলোচনা - সমালোচনার তাগিদে লেখকের কোনো একটি লেখার নিবিড় পাঠ করতে গিয়ে আমরা প্রায়ই সমসাময়িক তাঁর অন্য লেখা থেকে ধারণা নিতে চেষ্টা করি। আশাপূর্ণার ক্ষেত্রেও যদি লক্ষ্য করা যায় তাহলে সময়গত পরিসংখ্যানে ১৯৭১ থেকে ১৯৮০ পর্যন্ত প্রচার পূর্ণমাত্রায় ছটি উপন্যাস লিখেছিলেন তিনি। দূরের জানালা (১৯৭১), ঝিনুকে সেই তারা (১৯৭১), 'কখনো দিন কখনো রাত (১৯৭৫)। কিন্তু প্রায় সব কটি উপন্যাসেই পরিচিত প্রেক্ষাপট হিসেবে এসেছে মধ্যবিত্ত আটপৌরে পরিবারের ভাঙনকালের আলেখ্যে দাম্পত্য সমস্যার কথা। কখনো রমলা বা কখনো সুচিত্রা, সুরুচি এরা প্রত্যেকেই লেখিকার মনোনীত প্রেক্ষাপটে সামগ্রিকতার খণ্ড উপস্থিতি হয়ে হয়ে গেছে মাত্র। কিন্তু কোথাও নিজস্ব ছাপ ফেলে যেতে পারে নি। ফলে এই সময়ের পটভূমিতে লেখা—'বকুলকথা'র শম্পা - সত্যভামাদের যে বিকৃত আধুনিকতার ইতিহাসকে ধরার চেষ্টা করেন তিনি, তাতে শুধু কেন্দ্র থেকে উপকেন্দ্রে যাওয়াটাই সত্য হয়ে ওঠে। সময়ের কথকতাকে ছুঁয়ে যে —উপলব্ধির সম্প্রসারণ ঘটানো দরকার ছিল, তা যেন বকুলকথার প্রতিবেদনে প্রতিবিম্বিত হয় না। লেখিকা যদিও স্বীকারোক্তিতে জানিয়েছিলেন বকুলের ভূমিকা নায়িকার মত, দর্শকের, কিন্তু বকুল কিংবা অনামিকা দেবীর আত্মজৈবনিক আকল্পে রয়েছেন যে লেখিকা স্বয়ং তাঁর দৃষ্টিতে এমন এক প্রজন্মগত আধুনিকতার রূপ ফুটে উটেছে যা প্রকৃত অর্থে কোনো আধুনিকতাই নয়, নারী স্বাধীনতা কিংবা মুক্তি কোনো অবস্থার সঙ্গেই যুক্ত আবশ্যিক শর্ত নয়। এখানেই আশাপূর্ণার যে মনোভঙ্গি দেখি, তাকে লেখিকার নিহিত অভিপ্রায় বলে ভাবতে একটু থমকে যেতে হয়। কারণ যে - সময়ের কথা বিবৃত হয়েছে এ উপন্যাসে (উপন্যাসের প্রকাশকাল ১৯৭৪) তখনও কিন্তু কোনো মেয়ের যথেচ্ছভাবে 'সাড়ে পাঁচ বার' প্রেমে পড়ার অকুণ্ঠ সাবলীল উক্তির কথা ভাবাই যেত না। যতদিন পর্যন্ত আশাপূর্ণার কলম চলেছিল নিরুদ্ধ প্রক্রিয়ায় ততদিন পর্যন্ত অন্তত এ ধরনের একটি পাশ্চাত্য প্রভাবিত মেট্রোপলিটান মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি। তখন সবে কলকাতার আমূল রাজনীতিক পালা বদলের সূচনা হয়েছে। সে - হিসেবে মেয়েদেরও ইতিহাস গড়ার সূচনাপর্ব সেটা। তাই যদি ধরেও নিই আশাপূর্ণা কোনো সমাজ ভবিষ্যৎকে দেখতে চাইছেন, তবেও প্রশ্ন থেকে যায় বকুল থেকে শম্পার মধ্যবর্তী রাজনৈতিক সামাজিক ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণের বহুমাত্রিক পাঠ কোথায়! অনামিকা দেবীর উক্তিতে তো সেই সত্যের স্বর শোনা যায়।

''আমি দেখতে পাই ভয়ঙ্কর প্রগতির হাওয়ার মধ্যেও জায়গায় জায়গায় বন্দী হয়ে আছে সেই চিরকালের দুর্গতির রুদ্ধশ্বাস দেখতে পাই আজও লক্ষ মেয়ে— সেই আলোহীন বাতাসহীন অবরোধের মধ্যে বাস করছে। এদের বাইরের অবগুণ্ঠন হয়তো মোচন হয়েছে। কিন্তু ভিতরের শৃঙ্খল আজও অটুট।''

তাই বলতে পারি, বকুল কিংবা অনামিকা দেবীর দুর্বল চোখে দেখা নারী - স্বাধীনতার যে-দিক ভেসে ওঠে এ উপন্যাসে তা আমাদের নারী - স্বাধীনতার প্রশ্নে উদ্ভাসিত করে না, বরং আমাদের ভারাক্রান্ত করে তোলে। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জনীয় স্বাধীনতা কিংবা মুক্তির স্বাদ শম্পা কিংবা সত্যভামাদের স্বেচ্ছাচারী জীবন-যাপনের সমতুল্য নয়। ফলে বকুলকথায় নিবিড় পাঠক পাঠককে অপ্রাসঙ্গিক বক্তব্যের ভারে ভারাক্রান্ত করে তোলে। তবে পাঠক যত এগোয় ততই ধারণার কোনো দ্বিরুক্তি ঘটে না যে আশাপূর্ণার দ্বৈতসত্তা কিন্তু বকুলকথার নিভৃতপাঠে সক্রিয় থেকেছে। পারুল ট্রেনের জানালায় যে স্মৃতি হাতড়ে ফেরে তাতে কিন্তু পারুলের বক্তব্যে বকুলের কালকে তুলে আনতে প্রয়াস করেন লেখিকা—

'ধারণা ছিল মনের নিয়ম অনেকটা সিঁড়ি নিয়মের মত। যে ধাপে ধাপে পবিবর্তিত হতে হতে চলে...তা হলে কি আমার অন্যমনস্কতার অবকাশে—একটা যুগ তার কাজ করে চলে গেছে, আমি খেযাল করিনি?

নইলে সে যুগটা কোথায় গেল? আমার যুগটা?

সে কালটা তবে গেল কোথায়? যেটার জন্যে আমাদের আশা ছিল, তপস্যা ছিল, স্বপ্ন ছিল?

এখন যাদের 'কাল' তারা একেবারে নতুন, একেবারে অপরিচিত, তাদের কাছে শিখে খোঁজ করা যায় না, হ্যাঁ গো সেই 'কাল' কোন্ ছিদ্র দিয়ে গলে পড়লো? দেখতে পেলাম না তো? আমাদের তপস্যাটা তাহলে স্রেফ বাজে গেল?''

পারুলের এই আক্ষেপ খুব প্রাসঙ্গিক, সুবর্ণলতার জীবন দহনের ইতিহাসের সঙ্গে অসতর্কভাবে হলেও খুব ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল বকুল। সে ছাদের কোণে চিতায় লক্ষ করেছিল পুড়ে যাওয়া মায়ের সৃজন - ধ্বংসের ইতিহাসকে, অনুভব করেছিল মায়ের আর্তযন্ত্রণার বিহ্বলতাকে। কিন্তু তবুও ভাস্বর হয়ে ওঠেনি বকুলের প্রতিবাদ, সেই অস্তিত্ব সংকটের ঐতিহাসিকতার। কিন্তু পারুলের সঙ্গে সুবর্ণের তেমন কোনো গভীর সম্পর্কের ইঙ্গিত উপন্যাসে পাওয়া যাবে না। যেটুকু এসেছে তাও বকুলের প্রসঙ্গক্রমে। কিন্তু সম্ভ্রমের দূরত্ব রচনা করেও মায়ের আত্ম দহনে নিজেকে উদ্ভাসিত করে নিয়েছিল পারুল এবং বারবারই তার নিজের কালের প্রতি এক অসীম মমতায় সে প্রতীক্ষার ডালি সাজিয়ে 'লড়াই' করে পাওয়া সেই স্বাধীনতার জন্য। লেখিকা যেন কেন্দ্র - উপকেন্দ্রের ভারকেন্দ্রটিকে সমান্তরালভাবে ধরে রাখার এক অভিনব প্রয়াস করেন সম্পূর্ণ উপন্যাসটিতে। বকুলের সমান্তরালভাবে ধরে রাখার এক অভিনব প্রয়াস করেন সম্পূর্ণ উপন্যাসটিতে। বকুলের হারিয়ে যাওয়া খাতার অপূর্ণ বক্তব্যকে পারুলের স্মৃতিচারণে ফিরিয়ে আনেন আর পাশাপাশি বকুলের দর্শকাসনে তুলে ধরে শম্পা - সত্যভামাদের এক অনামী অদেখা ইতিহাস। কেন না হঠাৎ করে কোনো যুগের পত্তন ঘটে না, কিংবা মোমবাতির মতো গলে পড়লেও তার শেষ চিহ্নটুকু রেখে যায়, তাকে প্রত্যক্ষ করতে চাই ঔপন্যসিকের দ্রষ্টা চোখের আলো।

পরিবর্তনই যেহেতু বিবর্তনের প্রাথমিক শর্ত, তাই বকুল - পারুলদের নিজস্ব যুগেও খুঁজে নিতে হয় বয়ানের ইশারায়। কেন না দখিণের বারান্দায় অপ্রাপ্তি নিয়ে কাটিয়ে যাওয়া সুবর্ণলতাদের যে-জীবন আর প্রেমের বদলে 'চার্ম' খুঁজে বেরোয় যে শম্পারা তাদের জীবন —এই দুইয়ের মধ্যবর্তী সংযোগসূত্রটি বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। যদিও 'স্বাধীনতা' নারীর জীবনে কী ভয়ানক অভিশাপ হয়ে আসতে পারে তার প্রতিই যেন তর্জনী সংকেত করতে চেয়েছে আশাপূর্ণা। কিন্তু পাশাপাশি এও সত্য যে নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে

তিনি বলেছিলেন যে চার দেয়ালের আটপৌরে জীবনচর্যা থেকে তিনি খুঁজে পান তাঁর শিল্প নির্যাস। তাহলে কি সম্পূর্ণ সচেতনবাবেই তিনি বকুলকে এড়িয়ে গিয়ে শম্পাকে নায়িকা করে তুলতে চাইলেন! আবার আধুনিক নারী —মনস্তত্বের যে অবশ্যম্ভাবী রূপে আশাপূর্ণার চোখে ধরে পড়েছিল সেখানেও কোনো উত্তরণ চোখে পড়ল না। বকুল কথার নিবিড় পাঠে শম্পাদের যে পারিপার্শ্বিক সত্য ফুটে ওঠে তাতে তো শম্পাকে 'স্মার্ট' এবং অতি প্রগতিশীল মেয়ে বলেই মনে হয়। যে নাকি তার পিসির যুগকে হারেমের যুগ বলে ঠাট্টা করে, যার কাছে জীবনের চার্ম-টা পাঁচ - সাতটা ছেলের সঙ্গে সম্পর্কের সহজ স্বাভাবিকতায়—সে -ই কিনা শেষ পর্যন্ত আদর্শায়িত প্রেমের একনিষ্ঠ সাধিকা হয়ে উঠল! এখানেই লেখিকার সময় - সচেতনতা অস্পষ্ট হয়ে যায় যদিও তিনি বকুলের দর্শক - চোখে আগামী প্রজন্মের কথা বলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত লেখিকা শম্পাকে সেই আদর্শের পথেই ফিরিয়ে দিতে পারত, আশাপূর্ণার দার্শনিক মাত্রা সেই অর্থে একজন ঔপনন্যাসিকের শিল্পসত্তার প্রায়োগিক পূর্ণতায় পৌঁছাতে পারেনি।

তাই 'বকুলকথা' -র পাঠ - নির্যাস থেকে এমন - এক ধারণায় পৌঁছানো যেতে পারে যে আশাপূর্ণার সৃজন - সত্তার গভীরেই কোনো অন্তর্দ্বন্দ্ব ক্রিয়াশীল ছিল। সত্যবতী কিংবা সুবর্ণলতার ইতিহাস লিখতে গিয়ে তার তেমন কোনো খোঁজ রাখেনি লেখিকা, তাই সমসাময়িক কালের থেকে এগিয়ে গিয়ে যখন তিনি সত্যবতী কিংবা সুবর্ণলতার সংগ্রাম কাহিনি লেখেন তখন তাতে লক্ষ্য - উপলক্ষ্যের সীমান্ত এলাকা বিলুপ্ত হয়ে প্রতিবেদন সম্ভাবনাময় স্পর্ধিত উচ্চারনে মূর্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু যখনই সংবেদনশীল মন নিয়ে দেখতে চাইলেন আগামী প্রজন্মকে, তখনই যেন আমরা আর প্রার্থিত জয়ের খোঁজ পেলাম না।

'বকুলকথা'-র শেষ পর্বে ঘোষিত হল জয়ের বার্তা— ''প্রত্যক্ষে যারা জিতেছে এখন তবে তাদের কথাই লিখতে হবে।'' —লেখিকার ঐ ধরনের বক্রব্য প্রাসঙ্গিক ব্যাখ্যার দাবি রাখে 'জয়' শব্দটির সঙ্গে মিশে আছে কিছু বাস্তব, কিছু আপেক্ষিক সত্য। স্বীকৃতি সব সময় জয়ের শিরোপা বহন করে না, তার অগুনতি দৃষ্টান্ত সাহিত্য মহলের যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। স্বীকৃতির মাত্রাতেও তারতম্য পরাভবের অন্য অভিষিক্ত তো হতে পারে। তাই পরিণামের বাস্তব সবসময় জয়ের লক্ষ্য স্থির করে না। সুবর্ণলতার সারা জীবনব্যাপী যে - সংগ্রামের ধারা তা কিন্তু তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে। এ প্রশ্নেই যদি থেমে যেত তাহলে লেখিকার এ উচ্চারণ ব্যঞ্জনার অনেকান্তিকতায় উঠে আসত কি? এ সম্ভাবনাময় উক্তির যোগ্য ব্যবহার কিন্তু ঘটেছে বকুলকথায়? লেখিকা যখন জয়ের ব্যাখ্যা দেন তখন প্রশ্ন জাগে লেখিকার কাছে জয়ের আসল রূপ কী ছিল? যদি শম্পাদের মেনে নেওয়ার প্রচলিত রীতিই জয়ের লক্ষ্য হয়, তবে সত্য - সুবর্ণদের আজীবন লড়ে যাওয়াটা কি শুধুই হারিয়ে যাওয়ার অন্য নাম! সত্যের অভিধাও তো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়, কেন না কোনো সত্যই স্থবির নয়। উনিশ শতকের অবগুণ্ঠিত সমাজের চালচিত্রে নারীর জন্য সবচেয়ে বড় সত্য ছিল তার ব্যক্তিক পরিচয়টিকে প্রতিষ্ঠা করা। অর্ধেক সত্তা নিয়ে ব্যক্তি তার প্রয়োজনীয় উপস্থিতির প্রায়োগিক ইচ্ছাকে ব্যক্ত করতে অসমর্থ। তাই সত্যবতী - সুবর্ণলতার লড়াই তো সেই 'আমি' টুকুকে জায়গা করে দেওযার জন্য। সত্যই যেহেতু আপেক্ষিক, তাই স্থির সংজ্ঞায় যখন ধরে নেওয়ার চেষ্টা করা হয় তখন তা কাঠামো-বন্দি আচরণের স্থবির শাঁসহীন খোলস হয়ে থাকে মাত্র। নতুন কোনো সম্ভাবনায় সত্যকে বহুমাত্রিক অভিধায় পৌঁছে দিতে পারে না। মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের সেই বহুশ্রুত উক্তি—

'নতুন করে পাবো বলে
হারাই ক্ষণে ক্ষণ
ও মোর ভালবাসার ধন।'

এই হারিয়ে যাওয়ার মধ্যেই তো সত্য তার যুগোপযোগী রূপকে স্থির করে নেয় কাঠামোধৃত বন্দিদশা ছেড়ে। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' বা 'সুবর্ণলতার আখ্যানে নারীর ব্যক্তি হয়ে ওঠার যে চরম সত্য পরিবেশিত হয়েছিল 'বকুলকথা'-য় এসে লেখিকার ভাবনায় প্রবহমানতা জোয়ারের উল্টোমুখী স্রোতে প্রকট হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যাওযার চিহ্ন তাতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাই আশাপূর্ণা যখন শম্পার চরিত্রের উল্টোমুখী প্রবণতায় (যা কিনা নারীর সেই প্রচলিত আর্কেটাইপ 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে')-র সমর্থিত ভাবনায় গড়ে তোলা জীবনকে জয়ের মোহর পরিয়ে দেন, আর সত্যভামাকে বিকৃত জীবনের সীমান্তে নিয়ে গিয়ে অন্তিম শাস্তি দেন; তখন মনে হয় আবার যেন একবার বঙ্কিমী সাহিত্যের আর্ট - নীতির দ্বন্দ্বে নীতির জয়ই ঘোষিত হল। তাহলে কি কিছুদূর চলার পর সত্যবতী - সুবর্ণদের লক্ষ্য হয়তো বা লক্ষবিহীন স্বেচ্ছাচারিতার মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়বে, তাতে লেখিকা আশঙ্কাকুল হয়ে উঠেছিলেন। নাকি নিজের মানসিক অবস্থান এবং কালিক পরিসরের দ্বন্দ্বের সিদ্ধান্তহীনতায় এমন প্রতিশ্রুতির শৈল্পিক প্রয়াণ ঘটল বকুলকথার অসম্পূর্ণ প্রতিবেদনে।

'বকুলকথা'য় এসে শম্পা - সত্যভামাদের সময় পরিসরের অবকাশে বাজিয়ে দেখার কোনো সুযোগই দিলেন না লেখিকা। উপন্যাসের দীর্ঘ কথাবস্তু জুড়ে শম্পার সতী - সাবিত্রী মার্কা পবিত্র ধর্মকে জাগিয়ে রাখতে প্রথম থেকেই বিপথগামী করে তুলছেন সত্যভামাকে, আর তার সমাপ্তি ঘটল মেয়েটির অকাল মরণে। আশাপূর্ণার মানসিক স্তরেই যে 'আধুনিক' শব্দটি নিয়ে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছিল, তারও একটা ব্যাখা খুঁজে পেতে পাঠক যদি আখ্যানে তার কোনো ব্যবহারিক বহুরৈখিকতা থাকত। কিন্তু বড্ড বেশি একরৈখিক সুরেই যেন তিনি কালগত পরিণাম একে শম্পার টিকিয়ে রাখা সম্পর্ককে জয়মাল্য পরিয়ে দিলেন। ফলে 'বকুলকথা' -র আখ্যান অন্তর্ঘাতমূলক সত্যের অপূর্ণ প্রতিবেদন হয়ে রইল।